জিন ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

সুধীর কুমার দত্ত

{ পূর্বে ভোরের কাগজে প্রকাশিত }

‘প্রথানুযায়ী নতুন উদ্ভাবিত যেকোনো সত্যের এটাই নিয়তি যে, শুর"তে সে হয় মতবিরোধী এবং শেষে কুসংস্কার’ঃটমাস হেনরি হাক্সলি

শব্দ সাজিয়ে কোনো ভাষায় লেখা হয় না আমাদের জীবনের নিয়মাবলী। শেখা হয় জিনের সাহায্যে। এই জিন রাসায়নিক কোডরূপে আমাদের কোষে কোষে অবস্থান করে। প্রতিটি জীবের গড়ন, তার বাঁচার ব্যবস্থা, স্বভাব চরিত্র, চালচলন– এসব কিছুই জিনের নিয়ন্ত্রণে। বিগত ১৫০ বছরের জিন গবেষণার ফলাফল বিশেষণ করে বিজ্ঞানীরা জিনের এই বিস্ময়কর ক্ষমতা আবিষ্কার করেন। এই গবেষণার পথিকৃত ছিলেন একজন ধর্মযাজক যার পোশাকি নাম জোহান গ্রেগর মেন্ডেল। তিনি ছিলেন চেকোশোভাকিয়ার ব্র"নের একটি গির্জার পাদ্রি। জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী উপায়ে তার বংশধরে প্রকাশ পায় তা নিয়ে ছিল তার দীর্ঘদিনের কৌতূহল। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত তার গবেষণার ফলাফল থেকে মেন্ডেল সেই রহস্য উদঘাটনের চাবিকাঠি খুঁজে পেলেন যা ঐতিহাসিককাল থেকে পৃথিবীশুদ্ধ চিন্তাশীলদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে রেখেছিল। মেন্ডেল কোনো প্রাণী নিয়ে গবেষণা করেননি। মটরশুঁটি গাছ ছিল তার পরীক্ষার বিষয়বস্ত'। গির্জাসংলগ্ন খোলা মাঠে মেন্ডেল সারি সারি মটরশুঁটি গাছের চাষ শুর" করেন। তিনি বহু বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের গাছ বাছাই করেন তার পরীক্ষা কাজে। যেমন লম্বা বনাম খাটো গাছ, সাদা বনাম রঙিন ফুল, মসৃণ বনাম কুঞ্চিত বীজ, সবুজ বনাম হলুদ ফল ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি গাছের পরাগ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অপর একটিতে ছড়িয়ে দেন। তৈরি হয় নতুন প্রজন্ম। এভাবে বিপরীত চরিত্রের এক প্রজন্মের বা নতুন ও পুর্বপ্রজন্মের গাছের মধ্যে পুনঃপুনঃ সংকরায়ন করে মেন্ডেল বহু অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেন উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মে এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয়। মেন্ডেল এই নিয়ম কয়েকটি সুত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এ গুলোই এখন মেন্ডেলের উত্তরাধিকার সুত্র নামে পরিচিত। এই সুত্রানুযায়ী একজোড়া স্ত্রী-পুর"ষ গাছ দেখে সঙ্গে সঙ্গে মেন্ডেল বলে দিতেন এ থেকে কী কী বৈশিষ্ট্যের গাছের জন্ম হবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তার এই জাদুকরি ভবিষ্যদ্বানীর পেছনে তার গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা। তিনি জানতে পারেন যে, জীবের সবধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার ভিতরের এক অদৃশ্য বস্ত' যা তার ভাষায় ফ্যাক্টরস বা পার্টিকেলস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এই বস্ত'ই বংশপরম্পরায় পিতামাতা থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। কী নিয়মে পিতামাতার এই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের বস্ত'গুলো যুক্ত হয় তা যে বুঝতে পারবে, তার পক্ষেই সম্ভব নতুন বংশধর সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বানী করা। আধুনিক চিকিৎসকরা এই সুত্রের সাহায্যে পিতামাতার অবস্থা পরীক্ষা করে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদির আগাম সতর্কবাণী করে থাকেন। আজো শস্যবিজ্ঞানীরা তাদের কৃত্রিম প্রজননের কাজে মেন্ডেলের এই উত্তরাধিকার সুত্র মেনে চলেন। এর সাহায্যে তারা সহজ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোনো কোনো গাছ সংকরায়ন করে উন্নত শস্য ফলানো সম্ভব। মেন্ডেল ১৮৬৬ সালে তার গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্ত' দুঃখের বিষয় কেউই তখন তার এই অসাধারণ কৃতিত্বের দিকে ভ্র"ক্ষেপ করেননি। এরপর কেটে যায় প্রায় অর্ধশতক। ১৯০০ সালে তার গবেষণার ফলাফল আবার নতুন করে আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। তারা মেন্ডেলের ঐ ফ্যাক্টরসের নাম দেন জিন। জিন শব্দ আসছে গ্রিক শব্দ জেনস থেকে। অর্থ, বংশ বা

বংশধররূপে উদ্ভব। এই আধুনিক জিনই হলো মেন্ডেলের ফ্যাক্টরস যা পুর্বপুর"ষ থেকে পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয়। এভাবেই শুর" হয় জিন বিজ্ঞান বা বংশানুগতিবিদ্যা।

শপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে অণুবীক্ষণ যন্ে□র উদ্ভাবনের ফলে দেখা গেলো সব জীবই ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। ঊনিশ শতকে এসে অণুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি উলেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা এবার জীবিত কোষের অভ্যন্ত্মরের রহস্য উদঘাটনে সচেষ্ট হন। ১৮৮০ সালে একদল বিজ্ঞানী ঘোড়ার অন্ে□ বসবাসকারী এক প্রকার কৃমি অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করতে গিয়ে ঐসব কৃমির কোষের তরল পদার্থে অদ্ভুত সুতাকৃতি কীসব বস্' ভাসতে দেখেন। তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন কোষগুলোর বিভাজনকালে ওই সুতাকৃতি বস্'গুলোও এক চমৎকার নৃত্যের ছন্দে সঞ্চালিত হতে থাকে। এক সময় তারা জোড়া বাঁধে, বিভাজিত হয় এবং শেষমেশ পৃথক হয়ে দুটি নতুন কোষে চলে যায়। প্রতিটি অপত্যকোষ এভাবে ঐ সুতাকৃতি বস্'গুলোর সমান অর্ধেক লাভ করে। প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় বিজ্ঞানীরা দেখলেন ঐ একটি পদ্ধতি চক্রাকারে চলতে থাকে।

১৯০০ সালে মেন্ডেলের উত্তরাধিকার সুত্র পুনঃআবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা এবার কোষের অভ্যন্ত্মরে জিনের অনুসন্ধানের কাজ শুর" করেন। বহু সমীক্ষার পর তারা বুঝতে পারলেন ঐ জিন কোষের অভ্যন্ত্মরে নৃত্যরত সুতাকৃতি বস্'গুলোর মধ্যেই থাকে। ওই বস্'গুলোর নাম ক্রোমজোম। এই ক্রোমজোমকে যিনি সবাইকে জ্ঞাত করার চেষ্টা করেন তিনি নিউইয়র্ক শহরের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থমাস হান্ট মরগ্যান। মরগ্যান গবেষণার জন্য ড্রসো ফিলা নামের পাকা ফলে সঞ্চারমান একপ্রকার সুক্ষ্ম মাছি বাছাই করেন। এই ফ্রুট ফ্লাই নিয়ে গবেষণা সুবিধাজনক। এরা দ্র"ত এবং বেশি সংখ্যায় বংশ বৃদ্ধি করে ফলে বড়ো বড়ো প্রশ্নের উত্তর পেতে মরগ্যানের মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতো। গত শতকের চলিশের দশকে মরগ্যান ও তার সহকর্মীরা প্রমাণ করেন ক্রোমজোম থেকেই জিনের উৎপত্তি। তারা ক্রোমজোমের আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করে তার আসল চেহারা উদঘাটনের চেষ্টা করেন। ক্রোমজোমের কোনো কোনো স্থানে ড্রসোফিলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ে□ণকারী এক একটি জিনের অবস্থান তা এরা আবিষ্কার করেন এবং তার চমৎকার মানচিত্রও অঙ্কন করেন।

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যেকোনো বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারী হওয়ার পেছনে জিনের কী ভুমিকা। তারা আরো জানলেন জিনের অবস্থান। এবার তাদের কৌতূহল জিনের গঠন। কী কী রাসায়নিক উপাদান রয়েছে এ জিনে? এ রহস্য প্রথম উদঘাটন করেন জার্মানির এক প্রাণ রসায়নবিদ জোহান ফ্রেডারিক মিশার। এই বিজ্ঞানী হাসপাতাল থেকে পচনকারী ক্ষতের পরিত্যক্ত ব্যান্ডেজ এনে সেখান থেকে পুঁজ সংগ্রহ করতেন। এই পুঁজের মধ্যে সাদা রক্ত কোষ থাকে যা রোগীকে ঘা নিরাময়ে সাহায্য করে। ক্ষতের পুঁজ থেকে রাসায়নিক বস্'গুলোকে পৃথক করতে থাকেন মিশার। তিনি বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন কোষের নিউবিয়াসে অদ্ভুত প্রকৃতির কিছু রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এছাড়া কোষের অবিভাজিত ক্রোমজোমও ঐ নিউক্লিয়াসেই অবস্থান করে। মিশার তার আবিষ্কৃত রাসায়নিক বস্'র নাম দিলেন নিউক্লিক এসিড। এর অনেক পরে ১৯৪৪ সালে অসওয়াল্ড থিয়োডোর এভারি নামের জনৈক আমেরিকান ডাক্তার প্রমাণ করেন যে, জিন নিউক্লিক এসিড দ্বারা তৈরি। তিনিই ব্যাক্টেরিয়ার যৌন প্রজনন আবিষ্কার করেন এবং লক্ষ্য করেন নিউক্লিক এসিডের মাধ্যমেই এক ব্যাক্টেরিয়ার জিন অন্য ব্যাক্টেরিয়ার স্থানান্ত্মরিত হয়। তার মতে এই নিউক্লিক এসিড ও মেন্ডেলের ফ্যাক্টরস মুলত একই জিনিস। কিন্' দুঃখের বিষয় ১৯৫০ সালের পুর্ব পর্যন্ত্ম এভারি তারই অসাধারণ গবেষণার কোনোই মুল্য পাননি।

এরপর ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটসন, ক্রিক ও ফ্রাঙ্কলিন এই তিন বিজ্ঞানী মিলে এক্সরে ব্যবহার করে ডিএনএ নামের নিউক্লিক এসিডের গঠন আবিষ্কার করেন। ফ্রাঙ্কলিন গবেষণাগারের দুর থেকে ডিএনএ ক্রিস্টালের ওপর মেশিনের সাহায্যে এক্সরের বিস্ফোরণ ঘটান এবং গবেষণাগারের চারপাশে এই রশ্মি কী বেগে ঠিকরে পড়ে তার হিসাব রাখতেন। ওয়াটসন ও ক্রিক দুরের রেস্টুরেন্টে বসে ফ্রাঙ্কলিনের কাজের ফলাফল সংযোজন করে পু□খানুপু□খ পরীক্ষা করতেন। কয়েক ঘণ্টা এভাবে হিজিবিজি আঁকাআঁকির পর তারা দুজনে এবার গবেষণাগারে এসে ডিএনএ-এর একটি মডেল তৈরি করেন। মডেলটি দেখতে সুর্যের বেশভুষায় সজ্জিত অদ্ভুত পেঁচানো সিঁড়ির মতো। ডিএনএই হলো ক্রোমোজামের অভ্যন্ত্মরে জিন তৈরির পণ্য। এই অসাধারণ আবিষ্কারের জন্য ওয়াটসন ও ক্রিক নোবেল পুরষ্কার পান। কিন্' ফ্রাঙ্কলিনের দুর্ভাগ্য, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত্ম হয়ে ১৯৫৮ সালে মারা যান। ফলে দুই পুর''ষ সহকর্মীর মতো তার কোনো প্রশংসা বা আন্ত্মর্জাতিক খ্যাতি অর্জন ভাগ্যে জোটেনি। বিজ্ঞানীরা জিনের অবস্থান জানলেন, জানলেন এটি কী উপায়ে বংশধরে সঞ্চারিত হয়। জিন কী উপাদানে তৈরি তাও জানতে বাকি রইলো না। কিন্' জিন কেমন করে কাজ করে এটাই এখন তাদের জানার বিষয়। ওয়াটসন ও ক্রিক এ সমস্যা সমাধানের পথ বের করেন। ডিএনএ একটি পেঁচানো সিঁড়ির মতো অণু। সিঁড়ির দুপাশ চারটি ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক একক দ্বারা যুক্ত। এই এককগুলোকে বলা হয় বেস।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)